জীবন আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিলো

একজন শিল্পপতি এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক কিভাবে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন, কিভাবে মনের জোরে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলেন, সেই গল্প বলব আজ আপনাদের। ঘটনাটি লোমহর্ষক ও আশ্চর্যজনক। রোগীর নিজ ভাষায় শুনুন সেই গল্প।

২০১০ সালের আগস্ট মাসের কথা। আমি তখন ভারতের জয়পুরহাট থাকি স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে। দিল্লি যাচ্ছি একটা অফিসিয়াল মিটিংয়ে যোগ দিতে। আমরা জয়পুরহাট দিল্লি হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি। মিটিংয়ের পর আমার মুম্বাই যাওয়ার কথা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা রাজপথে চলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা একটি গ্রামে পৌঁছেছিলাম। ওই গ্রামের রাস্তাটি ছিল এক দিকে চলাচলের রাস্তা। হঠাৎ দেখি দূরে একটা ট্রাক আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে বিপরীত দিক থেকে। বুঝতে পারি একটা অঘটন ঘটবে। তখন আমার মোবাইলে কল এলো। আমি সেটা না ধরে ফোন পকেটে রেখে দিলাম। ভাবলাম, দুর্ঘটনা ঘটলে মোবাইলটা রক্ষা পাবে। দুই সেকেন্ডের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমার গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ। আমি সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হলাম। বাঁচব কি না জানি না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমার স্নেহের ছেলেকে রক্ষা করো। তার অল্প বয়স। সে আমার নয়নের মণি। আমার জীবন। আমার আত্মা। আমার দেহ। আমার মন। আর কিছু মনে করতে পারছি না।

আমার গাড়ির চালক দুর্ঘটনা ঘটার পর পালিয়ে গেল। এক ঘণ্টা পর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি আমি পুলিশ ভ্যানে শুয়ে আছি। যন্ত্রণায় চিৎকার করছি বা কাতরাচ্ছি। কথা বন্ধ, তবুও যেকোনো প্রকারে পুলিশকে আকার-ইঙ্গিতে একটা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে বললাম, যাতে আমি মুম্বাই যেতে পারি অথবা জয়পুরহাট কিংবা দিল্লি। কিন্তু কেউ আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। আমাকে একটা মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ওই দিন ছিল রোববার। কোনো ডাক্তার ছিল না। আমার অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন। বুকের ভেতর অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা। দেহের বাইরে কোথাও রক্তপাত বা রক্তক্ষরণ নেই। শরীরের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে। মনে হয় এসব কারণে আমার অবস্থাকে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছিল না। আমারও মনে হচ্ছিল, আমার মারাত্মক কিছু হয়নি। শিগগিরই উঠে বসব, কিন্তু বুকের ভেতরকার যন্ত্রণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

অবশেষে হাসপাতালে কর্মরত লোকজন আমার CT Scan, X-ray ও MRI করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমার বুকের ভেতরের জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য অনুরোধে তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। X-ray ও MRI রিপোর্টে দেখা গেল, আমার বুকের ৯টি পাঁজরের কাঠির মধ্যে আটটি ভেঙে গেছে। এটা বুকের ডান পাশে। বাম পাশের দু'টি পাঁজরের কাঠিও ভেঙে গেছে। ডান পাশে একটি পাঁজর কাঠি ভেঙে ফুসফুসে ঢুকে গেছে। এ কারণেই ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ ছাড়া আমার কলার বন (Bone) বা কলার হাড় ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে।

রোববার হওয়াতে কোনো মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টও ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, এর পরে আমার অবস্থা কী হবে।

লোকে বলে, ঈশ্বর রহস্যপূর্ণভাবে মানুষকে সাহায্য করেন। ওই দিন আমি এ কথার সত্যতা দেখতে পাই। আমি হাসপাতালে পড়ে আছি। যন্ত্রণায় ছটফট করছি। কখনো কাতরাচ্ছি। জানি না বাঁচব কি না। হঠাৎ একজন কম্পাউন্ডার এলেন। আমার রিপোর্ট দেখে তিনি মর্মাহত। জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমি বাম হাত দিয়ে একটা কাগজে লিখে জানালাম, আমার বাম হাত ও হাতের আঙুলগুলো অক্ষত ছিল। আমি তাকে আমার পারিবারিক চিকিৎসকের সাথে কথা বলতে অনুরোধ করলাম। আমি নিজে তাকে ডায়াল করে স্পিকার অন করে দিলাম। কম্পাউন্ডার আমার অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন তাকে। তিনি আমাকে বললেন, আমি এই কম্পাউন্ডারকে এখনই কিছু নির্দেশ দিলাম। ওটা করলে তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা একটু বাড়লেও তুমি ধৈর্য ধারণ করো। অসহ্য যন্ত্রণা ও কষ্ট হলেও উপকার হবে। আমাদের পারিবারিক ডাক্তার ফোনে কম্পাউন্ডারকে কিছু নির্দেশনা দিলেন।

কম্পাউন্ডার আমার শার্ট খুলে ফেলল। একটা একটা করে সব পাঁজর পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন– সেখানে কোনো অ্যানেসথেসিয়া, ওষুধ ও সার্জিক্যাল কাঁচিও ছিল না। ছিল একটা ছুরি। সেটাকে স্পিরিট দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। আমার ডাক্তারের নির্দেশ মোতাবেক কম্পাউন্ডার পাঁজরের মাঝে কাটলেন। কাটার সাথে সাথে ভেতর থেকে কল কল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে। যেন কেউ ভেতর থেকে ট্যাপে রক্ত ছেড়ে দিয়েছে। পরে চিকিৎসকদের কাছে শুনেছিলাম, মানবদেহে পাঁচ লিটার রক্ত থাকে। আমার দেহ থেকে তিন লিটার বেরিয়ে গেছে ওই দিন। ওই কাটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল রক্ত বের করে দিতে। অন্যথায় অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে আমি মারা যেতাম। কম্পাউন্ডার সেটি কেটে দেয়ার সাথে সাথে আমি চেতনা হারাই। যখন আমার জ্ঞান ফিরল, দেখি আমি একটা অ্যাম্বুলেন্সে। আমার চিকিৎসক মুম্বাইয়ে অবস্থানরত আমার বাবা ও জয়পুরহাটে আমার কাকার সাথে যোগাযোগ করেন। আমাকে জয়পুরহাট নিয়ে যাওয়া স্থির করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলেন। সারা রাস্তা অ্যাম্বুলেন্সে রক্তক্ষরণ হয়। রাত ১১টায় জয়পুরহাটে পৌঁছে যাই এবং আমাকে একটি বিখ্যাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন।

আমার স্ত্রী ও ছেলে যখন আমার দুর্ঘটনার খবর পায়, তারা দৌড়ে আমাকে দেখতে আসে। আমি যখন খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে নিবিড় পরিচর্যায়

নিয়ে ভেন্টিলেটরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চিকিৎসক আমার বাবাকে অবহিত করেন, আমাকে তারা ভেন্টিলেটরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার বাবা তখন অস্থির হয়ে আইসিইউ কক্ষের বাইরে পায়চারি করছেন।

আমি তখন তাদের কাছে আরেকটি কাগজ ও কলম চাই এবং চিকিৎসককে লিখে জানাই, আমার ভেতর যদি প্রাণ থাকে, আমি বেঁচে যাবো। আমাকে ভেন্টিলেটরে রাখার প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস, এত দূর যদি এসে থাকি, এক রাতে কিছুই হবে না। ডাক্তার আমার মনোবল দেখে আশ্বস্ত হন এবং ভেন্টিলেটরে রাখলেন না। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় ভালোভাবে রাত অতিবাহিত হলো। পরবর্তী রাতগুলোও ভালোভাবে কাটল। ভেন্টিলেটর লাগল না।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ সযত্নে চিকিৎসার পর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকি। আমার কলার বোন (Bone) এবং আহত পাও ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে। কিন্তু সমস্যা হলো আমার বুকের পাঁজরের কাঠি। এখনো আমার বুকে রয়েছে ১০টি ভাঙা পাঁজরের কাঠি। সামান্য হাঁচি বা কাশি দিতে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়। সাত বছর অতীত হলেও মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। সে কী যন্ত্রণা, যা বর্ণনাতীত। ওটা এখনো আমাকে উতলা করে। ভাবি ও কামনা করি, এমন দুর্ভাগ্য যেন আর কারো কখনো না হয়। আমার পাঁজর ধীরে ধীরে ভালো বা সুস্থ হতে থাকে। এ জন্য কোনো চিকিৎসা নেই। আমাকে শুধু ব্যথানাশক ওষুধ দেয়া হয়। পরামর্শ দেয়া হয়, শয্যায় সটান হয়ে শুয়ে থাকতে। এক সপ্তাহ পর ডাক্তার ও আমার পরিবার আমাকে উঠে দাঁড়াতে উৎসাহিত করতে থাকে। আমাকে লবিতে হাঁটতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু এক পা উঠাতে যেন আমার শরীরের সব শক্তির প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ছিল আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ।

কিছু দিনের মধ্যে আমার জীবনে এলো সর্বাপেক্ষা দুঃসময়, কিন্তু চিকিৎসার উপকারী সময়। আমাকে দেয়া হলো Spiro meter, অর্থাৎ ফুসফুসে গৃহীত বায়ু ও বহিঃশ্বসনকৃত বায়ু পরিমাপের যন্ত্র। এটা এমন একটা যন্ত্র, যাতে রয়েছে তিনটি বল। আমাকে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করতে হবে ভেতরে। প্রতিটি শ্বাসে ওই বলগুলো বড় হবে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জন্যও এটা উত্তম ব্যায়াম ফুসফুসের জন্য; কিন্তু আমার জন্য এটা কল্পনাতীত কষ্টদায়ক। ডাক্তার আমাকে বলেন, প্রতিদিন ২০ বার করতে হবে এবং আমি সুস্থ হতে থাকব। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার চিন্তা ওটা করতে উৎসাহিত করে। শক্তি জোগায়। এভাবে ব্যায়াম করি ২০ দিন। আমি তখন ২০ বার শ্বাস নিতে ও ছাড়তে পারি। আমাকে তখন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হলো। যদিও আমি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার শক্তি অর্জন করেছি।

অবশেষে মুম্বাই এলাম। বাড়ি ফেরার অনুভূতি আমাকে আশাবাদী করে তুলল। বিশ্বাস হলো, আমি বেঁচে যাবো। শিগগিরই নিজ পায়ে হাঁটা ও চলাফেরা করতে পারব। এই চিন্তা আমাকে আরো শক্তি জোগাতে থাকে। আমি আমার চলাফেরার হুইলচেয়ার ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করি। আমি আমার Spiro meter ব্যবহার আবার শুরু করি, যাতে আমার পাঁজরের কাঠিগুলো স্বাভাবিকপর্যায়ে চলে আসে। বিশেষভাবে ডান পাশে যে পাঁজর কাঠিখানা আমার ফুসফুসের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল, সেটা যাতে স্বাভাবিক জায়গায় চলে আসে, এটাই আমার কামনা। সেই সাথে আমাকে কিছু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ব্যায়াম করতে হবে। সাথে নিতে হবে ব্যথানাশক ওষুধ।

ধীরে ধীরে আমাকে Spiro meter-এ ৫০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বলা হয় দৈনিক এবং সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়। আমার স্ত্রী সর্বক্ষণ আমার সেবায় নিয়োজিত। আমার সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু এখন আমি সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। কারণ, শূন্য মন শয়তানের বাসা। আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নভেম্বরের মধ্যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারণ, তখন আমার ছেলের জন্মদিন। তার জন্মদিনে আমি জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি দিতে চাই। ওই দিনই আমি হাঁটাচলা করতে চাই স্বাধীনভাবে। আমি রোজ ৫০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে করতে সেটাকে বাড়াতে থাকি এবং ১০০ থেকে ২০০ বার বাড়াই। আজ আমি ৭০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি। এটা আমার চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য। এটা যদিও বেশ কষ্টদায়ক ছিল, কিন্তু যখন ৭০০ বারে উন্নীত হই, তখন যেন আমার শক্তি বেড়ে যায়। ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে সেটা আমি করতে সক্ষম হই। ডাক্তার নির্দেশিত তরল খাবার খাই। তখন শক্ত খাদ্য গ্রহণের অনুমতি পাইনি। কারণ, শক্ত খাবার খেলে ভেতরে জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে যেতে পারে।

আমার বুকের পাঁজর যখন সুস্থ হতে থাকে, তখন ভাঙা কলার বোনের চিকিৎসার জন্য ফিজিওথেরাপি শুরু করি। এক মাস পর আমাকে বাড়ির ভেতর দশ পা হাঁটাচলার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু আমি ত্রিশ-চল্লিশ পা হাঁটতে থাকি, যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারি।

এমন রোগ চিকিৎসায় জরুরি শক্তিশালী মনোবল। আমার তা ছিল। তিন মাস গেল। আমার ছেলের জন্মদিনে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব করি। সে পার্টিতে অনেক লোকসমাগম হয়। আমি হাঁটাচলা করি। তার পর কাজ করতে শুরু করি। গাড়ি চালিয়ে আমার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসি। আমাকে কিছু বিশেষ ব্যায়ামের নির্দেশনা দেয়া হয়, সেগুলো Cardio and yoga। কোনো ভারোত্তলন দেয়া হয়নি।

আমি এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছি। কোনো বিধিনিষেধ নেই। শুধু একটা সমস্যা, কোনো ঠাণ্ডা স্থানে বেশি সময় থাকতে পারি না। আমার হার্ট ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়।

আমার স্ত্রী, ছেলে, পরিবার-পরিজন সবাই আমাকে সুস্থ হতে সহযোগিতা ও সমর্থন করে। তারা আমাকে কোনো রোগী মনে করেনি। আমার দুর্ঘটনার তিন বছর আগে এক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তিন মাস আমি যেন সাবধান ও সতর্ক থাকি। যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু আমি তার ভবিষ্যদ্বাণী উপেক্ষা করি। কারণ, আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখি জ্যোতিষীর কথা সত্য হলো। প্রকৃতির কিছু শক্তি আছে। এখন আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে বিশ্বাস করি এবং শ্রদ্ধা করি।

ওই দুর্ঘটনার পর জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে যায়। দুই মাস বিছানায় শুয়ে ভাবতাম, আমি তো না-ও বাঁচতে পারতাম। যদি ওই কম্পাউন্ডার আমার বুক কাটতে না পারত তাহলে কী হতো? কী হতে পারত? সে তো কোনো সার্জন ছিল না। আমাদের পারিবারিক ডাক্তারের নির্দেশ মোতাবেক যদি সাহস করে না কাটতে পারত, তাহলে কী হতো? তাও সার্জারি অস্ত্র দিয়ে নয়, সাধারণ ছুরি দিয়ে কাটা।

জীবন আমাকে বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় সুযোগ দিলো। এখন আমি মানুষের উপকারের জন্য কিছু করতে চাই। আজ আমি একটা দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি করেছি। আমি এখন পৃথিবীকে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য শ্রেষ্ঠ নিরাপদ স্থান তৈরি করে রেখে যেতে চাই, যেখানে দুস্থ-নিপীড়িত অসহায় মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবে। নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখবে। আমি আমার দাতব্য চিকিৎসালয়কে একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট করে রেখে যাবো।

লেখক : HARSHA ADVANI

অনুবাদক : **অধ্যক্ষ জোবেদ আলী**